Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 122–129
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শতবর্ষের আলোকে কবি নজরুলের 'প্রলয়োল্লাস'

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: ganguly094@gmail.com

Keyword
বাংলা কবিতা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, প্রবাসী, হাবিলদার, ধুমকেতু, মৌলিক কবি

Abstract

Discussion

১

নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় যে দুর্বার-অপরাজেয় কণ্ঠস্বরের স্ফুরণ ঘটান তা এক বিশেষ মাইলফলক রূপে প্রতিভাত হয়। যেখানে একদিকে মানবতাবাদের পক্ষে উচ্চনিনাদ আর অপরদিকে রাজশক্তির কু-ভূমিকার বিপক্ষে নির্ভীক মনোভাব নজরুলকণ্ঠকে সংকটকালের জয়কেতন-রূপে সমাদৃত করে। নবপ্রজন্ম এখনও যে নজরুল-কবিতার তেজে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট হয় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে তখন, দেশীয় পরাধীনতার সমান্তরালে আন্তর্জাতিক উদ্যানে উত্তাল পরিস্থিতি; সব মিলিয়ে অসাম্য বোধে জর্জরিত এক ঘেরাটোপে কবি নজরুলের আবির্ভাব যেন মুক্তির ডাক বয়ে নিয়ে আসে সেই সময়। যিনি ব্যক্তি-মানসিকতায় সাম্প্রদায়িক বিভেদের উর্দ্ধে, ভদ্রলোকসুলভ কৃত্রিম বাবুয়ানিতে ভর না করা এক সৈনিক; যাঁর খোলা বোতামের নিচে উন্মুক্ত বুকের পাটায় যেন স্বভাবজ আত্মপ্রত্যয়ের গরিমা। ফলত কবিতার এই স্ব-ব্যক্তিত্বের তেজ অনেকের কাছে 'হুজুগের' মনে হয়েছে। তাই 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গবাণে পড়ে এই কাজী নজরুল ইসলাম বিকৃতার্থে হয়ে উঠেছিলেন 'গাজী আব্বাস বিটকেল।'

নজরুল স্কুল জীবন থেকে কবিতা লেখা শুরু করলেও (সম্ভবত) তাঁর প্রথম কবিতা (সমালোচকদের মতে পরিপক্ক কবিতা) প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায়। ১৮৯৮ সালে জন্ম নেওয়া কাজী নজরুল তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশের আগেই যান মেসোপটেমিয়া। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী পল্টনে ভর্তি হয়ে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে যান সেখানে। একজন বছর আঠারোর সৈনিকের সাহিত্য যে কত কাছাকাছি ছিল তা আমরা জানতে পারি সুকুমার সেনের কথায়—

> "মেসোপটেমিয়ার বাঙ্গালী পল্টনের মুসলমান সিপাহীদের তদারকের জন্য এক পাঞ্জাবী মৌলবী ছিলেন, যার মুখে হাফিজের কবিতা শুনে নজরুল মুগ্ধ হন, শিখতে থাকেন ফার্সী ভাষা। তাঁহার কাছেই নজরুলের ফার্সী কাব্যের পাঠগ্রহণ হয়।"[১]

বোঝা যাচ্ছে কতটা জীবনতৃষ্ণা থাকলে ভিনদেশের যুদ্ধক্ষেত্রের শিবিরে গিয়ে ভিন্নভাষার সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায়, কতটা আবেগের বারুদ হৃদয়ে ঠাসা থাকলে তা কবিতার পাতায় বিস্ফোরিত হয়। একথা সত্য যে, নজরুলের ভিতরের এই আন্তরিক আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং উচ্ছ্বাসময় প্রাঞ্জল মানসিকতাই তাঁর কবিতায় বৈপ্লবিক প্রলয় হয়ে ধরা দিয়েছে।

তবে 'প্রবাসী' পত্রিকায়, ১৩২৬ পৌষ-এ প্রকাশিত 'হাবিলদার' কবিতায় নজরুলের কবিতার চেনা দীপ্তিকে দেখা যায় না। সেখানে 'বরষ শেষে একটিবারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ'ই বেশি স্পন্দিত হয় যুবক নজরুলের 'অবুঝ হরষে।' কবি শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফেজ শিরজির ফার্সী কাব্যপ্রভাব তখনও যুবক নজরুল বয়ে চলেছেন তাঁর মানসকোনে। তবে তাঁর কবিতার আসল তান্ডব দেখা যায় দেশে ফিরে কিছুদিন পর বাঙালি জল-স্থল-বায়ুর পরিমণ্ডলে। আগুনে কাব্যকথার সুর বেরিয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রের বীণা থেকে ১৯২২ সালে। প্রকাশিত হয় 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ। বয়স আঠারো'তে চোখে দেখা তারুণ্যঘেরা তুর্কীদের যে উদ্যম যে অগ্নিভ মানসিকতা নজরুল মেসোপটেমিয়া গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন; আর ফিরে এসে একুশ বছরে যে ন্যুব্জ নত-শির পরাধীন ভারতকে দেখলেন। এই দুই দেখার বেহিসেবী গরমিলেই প্রলয়ের সুর ঝংকৃত হয়েছিল নজরুল কবিমানসে। পাশাপাশি প্রভাবিত করেছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী প্রভাব, স্বজাত্যবোধ। আর 'অগ্নিবীণা' নামটিও নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'গীতালি'র একটি গান (৫৫ নং) থেকে। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৩ আশ্বিন রাতে শান্তিনিকেতনে লেখা কবিগুরুর গানটি ছিল—

> "অগ্নিবীণা বাজাও তুমি/ কেমন করে/ আকাশ কাঁপে তারার আলোর/ গানের ঘোরে।"

তবে নজরুল কাব্যের মধ্যে সর্বত্রই ছিল উচ্ছ্বাসে ভরা তীব্র বলিষ্ঠ কণ্ঠের তান, যা বাঁধনছাড়া; আর মেজাজে বড্ড বেশি রবীন্দ্র-স্বতন্ত্র স্বরের পথবাহী। এটাই নজরুলের প্রকৃতিগত, তাই সহজেই অতিক্রমও করে গেছেন রবীন্দ্রপ্রভাবকেও।

'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি নজরুল উৎসর্গ করেছিলেন বিপ্লবী শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষেকে। মুজফ্ফর আহমদের 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' [২] থেকে জানা যায় 'অগ্নিবীণা'র উৎসর্গপত্রটি ১৯২০ সালে লেখা হয়েছিল 'ছন্দোবদ্ধ পত্র' হিসেবে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রতি নজরুলের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকার কারণে নজরুল এই ছন্দোবদ্ধ পত্রটি লিখেছিলেন। আবার বারীন্দ্রকুমার ঘোষ নজরুল-কবিতা সম্পর্কে প্রশংসা করলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যেও নজরুলের উৎসাহ হয়। আর সেই সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মাসিক কাগজ 'নারায়ণে'র পরিচালনার ভারও ছিল বারীন ঘোষেদের হাতে। ফলত তাদের সাথে পরিচিত হবার আগ্রহ দ্বিগুন বেড়ে যায়। তখন নজরুল ছন্দ বেঁধে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একখানা ছোট পত্র লেখেন। ১৯২০ সালের এই পত্রখানাই হল ১৯২২ সালে মুদ্রিত 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের 'উৎসর্গের গান।' নজরুলের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি যেহেতু প্রথম কবিতা হিসাবে স্থান পায় তাই কবিতার উপর এক বিশেষ নজর থেকেই যায়। আসলে কবিতার মধ্যে যে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা তার ঢেউ এসে লেগেছে তারুণ্যের প্রানবন্ততা থেকে যৌবনের সৌম্যতায়। কবিতাটি গ্রন্থে স্থান পাবার আগে প্রকাশিত হয় হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের জৈষ্ঠ সংখ্যায়।
মুজফ্ফর আহমদ জানিয়েছেন—

> "প্রলয়োল্লাস ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তো রচিত হয়নি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দও তার রচনাকাল নয়। কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কুমিল্লায়... ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শেষাশেষিতে আমরা এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিল। রুশ বিপ্লবের উপরে যে সে আগে হতেই শ্রদ্ধান্বিত ছিল... আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল তার সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা। তার সিন্ধু পারের 'আগল ভাঙ্গা' মানে রুশ বিপ্লব। আর প্রলয় মানে 'বিপ্লব'। আর জগৎ জোড়া বিপ্লবের ভিতর দিয়েই আসছে নজরুলের নূতন অর্থাৎ আমাদের দেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব আবার সামাজিক বিপ্লবও।" [৩]

নজরুল তৃতীয়বার কুমিল্লা যান ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে। সেখানে গিয়ে ওঠেন বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়িতে। আমরা জানি এর কিছু আগেই (১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে) 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লেখেন কবি। কবিতার মধ্যে 'বল বীর/ বল উন্নত মম শির' এর যে স্ফুরণ নজরুল ঘটান তার রেশ তখন শুরু হয়ে গেছে। প্রচুর জায়গায় নজরুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এই 'বিদ্রোহী'র বিদ্রোহী-সত্তায়। ফলত গোটা কুমিল্লা তাঁকে নিয়ে তখন মাতোয়ারা। কুমিল্লার হোটেলে ছাত্র ছাত্রীদের সাথে যেমন মুক্তমনে আড্ডা দিতেন তেমনই অবিনাশ ময়রার দোকানে রসগোল্লা পাঁউরুটিতে মজে উঠতেন। রাতে উস্তাদ খসরুর বাড়িতে চলত নিয়মিত গানের আসর। সেই সময়ই কবি লেখেন এই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি। সংবর্ধিত হন প্রতি মানুষের মনলিপিতে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা এবং তার রচনাকাল প্রেক্ষিতে— নজরুল সেবারই হিন্দু আশালতা সেনগুপ্তের (বিয়ের পর কবি নাম রাখেন প্রমীলা) সাথে বিবাহবন্ধ হন। ফলত আপর দিকে একটা বড় অংশ শ্রেণীর মানুষের মনে তাঁর প্রতি মিষ্টতা নিমেষেই তিক্ততাতেও পরিণত হয়। নজরুল ব্যক্তি জীবনের এই ইতিহাস জানা যায় বাঁধন সেনগুপ্তের 'কবি নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের বিবাহে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি শুভেচ্ছার বাণীও তাঁকে লেখেন ১৯২২-এ 'ধূমকেতু' প্রকাশের উদ্যোগ নিলে। রবীন্দ্রনাথের সেই শুভেচ্ছাবাণী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই মুদ্রিত হত তখন ধুমকেতু পত্রিকার শুরুতে—

"...আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু/ আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু/ দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/ উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।"

রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান নিশ্চিতভাবে প্রাভবিত এবং উৎসাহিত করেছিল নজরুলকে।

ধুমকেতু পত্রিকায় নজরুল কতকগুলি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন— যেমন, 'মোহররম সংখ্যা', 'আগমনী সংখ্যা', 'দেওয়ালী সংখ্যা', 'কংগ্রেস সংখ্যা।' 'ব্রিটিশ বিরোধী' প্রকাশনা সম্পাদনা পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮-নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। একই বছরের ২৩ নভেম্বর তাঁর 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং একই দিনে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করা হয় নজরুলকে। 'আনন্দময়ীর আগমনে' যথেষ্ট উত্তলিত করেছিল জনমানসকে। দৃপ্ত নির্ভীক সেই উচ্চারণ—

"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল? / স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।"

গ্রেফতারের পর কবিতার মতো নজরুলের জবানবন্দীও সমান ভাবে অটল ছিল। অস্ফুট চাপা সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, নজরুল তার হাতের 'ধূমকেতু'কে অগ্নি-মশাল করে তোলেন, কলমকে অস্ত্র বানিয়ে লিখে যেতে থাকেন। এই বলিষ্ঠতা তো তাঁর মানসিকতাজাত, যা কখনও কৃত্রিম হয়ে পড়েনি। অকৃত্রিম ঋজু থেকেছে চিরকাল। পাশাপাশি নজরুল উৎসাহ পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখা চালিয়ে যাবার কথা বলেন কারাগারে বসেই। ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ নজরুলের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গও করেন তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত।' জেলে নজরুলের জন্য এই বই পাঠিয়ে দেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মারফত। রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাদী শ্রদ্ধাবোধ নজরুলকে পথভ্রষ্ট হতে দেয়নি। হয়তো

পথভ্রষ্ট হতেনও না হয়তো নজরুল; তবে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উৎসাহ যে এক পুরস্কারস্বরূপ! কোন এক বৈপ্লবিক মশালের মুখে অন্য এক যুগান্তরকামী ব্যক্তিত্বের আগুন ধরানোটা ঠিক যতটা ঠিক ততটাই কিংবা তার থেকে বেশিও।

২

'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলকেই প্রথম 'মৌলিক কবি' বলে মনে করেন। আসলে নজরুলের মৌলিকত্ব তাঁর কবিতায় শুধু নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর মানসিকতায়। পরবর্তী কালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায় আমরা যে বলিষ্ঠতা পায় তা অনেকটা নজরুল-প্রভাবিত বলেই মনে হয়। তবে তা যে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বরও হয়ে উঠেছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র পর 'দোলন চাঁপা' কাব্যগ্রন্থ ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকার সময় 'দোলনচাঁপা' কাব্যের কবিতাগুলি লেখেন নজরুল। জেল কর্তৃপক্ষের অগোচরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ওয়ার্ডারদের সাহায্যে তার কবিতাগুলি বাইরে নিয়ে আসতেন। নজরুলের নির্দেশমতোই কবিতাগুলোর সংকলনে 'দোলনচাঁপা' প্রকাশ পায়। তবে বিদ্রোহী মানসের উচ্চকণ্ঠে লেখা শ্রেষ্ঠগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'ই। আর তার সাথে 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪) এবং 'ভাঙার গান' (১৯২৪) কাব্যগ্রন্থদ্বয় সীমাহীন নির্যাতন, অকথ্য শোষন, অপ্রতিরোধী অবিচারের প্রতিবাদে লেখা। এক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলাম একদিকে— স্বাধীন চিন্তাভাবনার সৌন্দর্যের প্রতি তিনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে তাঁর আদর্শকে জারি রেখেছেন; এবং অপরদিকে— রাষ্ট্রচিন্তায় সাম্যবাদের পক্ষে, সর্বহারাদের পক্ষে তাঁর অদম্য লড়াই-এর বাস্তববোধকে কবিতার অন্তরালে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেদিক থেকে প্রথম কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত প্রথম কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। প্রথম কবিতার নাম : 'প্রলয়োল্লাস', যা শতবছের আলোকে এসে আজও জীবন্ত, আজও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বর্তমানে সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষিতে।

আমাদের নিবিড় পাঠে ও বিশ্লেষণে 'প্রলয়োল্লাস'এর ঘর-বারান্দাকে এক্ষেত্রে দেখে নেওয়া যেতে পারে। দেখা যেতে পারে কেন এ কবিতা কালকে অতিক্রম করে কালজয়ী? এবং কীভাবে এই কবিতা পূর্বে আলোচিত নজরুল মানসিকতার নির্ভেদ পরিপূরক হয়ে ধরা দেয় পাঠক চিত্তে। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী' পত্রিকার 'জৈষ্ঠ' সংখ্যায় প্রকাশ পায়। কবিতার শুরুতেই কবি যে 'জয়ধ্বনি' করার হুঙ্কার দিয়েছেন তা ভীষণই আবেদনক্ষম—

> "তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
> ঐ নতুনের কেতন ওরে কাল- বোশেখীর ঝড়।
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
> তোরা সব জয়ধ্বনি কর!"

কিন্তু এই জয়ধ্বনির হুঙ্কার কাদের উদ্দেশ্যে? যারা পরাজয়ের গ্লানি আঁকড়ে জয় পাবার আশায় নিজেদের সঁপে দিয়েছে মাটির বুকে, তাঁদের উদ্দেশ্যেই কবির এই বার্তা। কিন্তু কেন এই জয়ধ্বনি? কেন বারবার এই জয়ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করলেন কবি? এই 'কেন'র উত্তরই সমগ্র কবিতায় বলতে চাওয়া হয়েছে; যা যেকোনো বিপ্লববাদকেই স্পন্দিত করে আজও।

প্রথমত, 'জয়ধ্বনি' করবার কারণ, কবির মানসচোখে দেখা একটি দৃশ্যপট— কালবৈশাখির ঝড়ে 'নূতনের কেতন' ওড়া! প্রশ্ন হল এই নূতনের কেতন ওড়ার সাথে জয়ধ্বনি করার কি সম্পর্ক? সোজা কথায়, 'নূতন' বলতে বোঝায়— বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ভারতে যে বিপ্লববাদের জন্ম, যা কিছু পুরানো রীতিনীতি তা বয়কটের প্রতি যে সওয়াল, অন্ধ সংস্কার থেকে জড়ময় দাসত্বকে এক লহমায় ধ্বংস করার যে শক্তি। এই নূতন, যা এতদিন মানুষের স্বপ্নে বীজের আকারে সুপ্ত ছিল তারই অঙ্কুরোদগম। কবিতায় মহীয়সী বৃক্ষের মতো এই জাগরনকে 'কেতন' এর সাথে

তুলনা করেছেন কবি। যে ‘কেতন’ স্বপ্ন থেকে জাগরনের পথকে, পরাধীন থেকে স্বাধীনতার পথকে দেখাতে পারে। যা কালবৈশাখি রূপ কালো ক্ষমতার প্রতাপে ছিঁড়ে পড়ে না মাটিতে, বরং কালবৈশাখির প্রতিকূলতাকে অনুকূল করে নিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। আর এই ‘কেতন’এর উড্ডীয়মানতাই জয়ধ্বনি করবার মন্ত্রের সন্মুখ মূর্তিবিশেষ।

দ্বিতীয়ত, কবি জানাতে চেয়েছেন— এক নৃত্যপাগলের আগমনের কথা, যে পাগল প্রলয়ের নেশায় মত্ত। যে পাগল সিন্ধুপারের সিংহদ্বারের আগল ভেঙেছে—

“আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল
সিন্ধুপারের সিংহ- দ্বারে ধমক হেনে ভাঙলো আগল।
মৃত্যু- গহন অন্ধ-কুপে
মহাকালের চন্ড- রূপে-
ধুম-ধুপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ংকর-
ওরে ঐ হাসছে ভয়ংকর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!”

আসলে এই নৃত্যপাগল নটরাজ শিব, যিনি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে, তান্ডবলীলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির বীজকে ফুটিয়ে তোলেন। এই পাগল তো আসলে বিপ্লবীরা, যারা নিজেদের কথা ভাবতে শেখেনি। নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে যে বিপ্লবীরা বন্দীত্বকে বরণ করে নেন। যাঁরা বন্দী বিনা বিচারে সেই আন্দামানের সেলুলার জেলে। এই জেলকেই কবি ‘সিন্ধুপারের সিংহদ্বার’ বলতে চেয়েছেন। যে দ্বার প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবীদের দ্বারা ভেঙে যাবে নিমিষেই। প্রলয়ঙ্কর বিপ্লবীরাই তাই কবিদৃষ্টিতে— এক. 'মহাকাল' বা 'শিবের সংহারক' মূর্তি রূপে; দুই. 'চন্ড' বা ভয়ংকর রূপে কিংবা তিন.'ধূম্র-ধূপে' বা ধূপের মাঙ্গলিক ধোঁয়া রূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে কবিতায়। আর এই তিন রূপই (মহাকাল, চন্ড, ধূম্র-ধুপ) মৃত্যুর কূপ থেকে জীবনকে বার করে আনতে পারে। পরাধীনতার কূপ থেকে স্বাধীনতার সূর্যকে আনতে পারে। শিব রূপ শক্তিই তা শিখিয়েছে অমৃতস্য পুত্রদের। তাই কবি বলেছেন ‘মৃত্যু গহন অন্ধকারে’ ভয়ংকর রূপ ধারন করে জয়ধ্বনি করবার কথা। আসলে মৃত্যু অন্ধকারে প্রধান সহায় ‘মনের মশাল’, যা বজ্রশিখার মতোই ভয়ংকর, যা লুকিয়ে আছে মেঘের আড়ালে ইংরেজদের অলক্ষ্যে। আর এই বজ্রশিখার মশালের আগমনেই তো ইংরেজদের পরাজয়। তাই কবি বলেন জয়ধ্বনি করবার কথা।

তৃতীয়ত, কবি একটি ‘সুন্দর চিত্র’কে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন বিদ্রোহের তীব্রতাকে বোঝাবার জন্য, বিপ্লববাদের ঝাঁজকে বোঝাবার জন্য। কেমন সেই চিত্র? চিত্রটি এমনই—

“ঝামর তাহার কেশের দোলার ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায়!
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল্ দোলে!
অট্টরোলের হট্টোগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর!”

দেখা যায়, অট্টরোল বা হট্টগোলের মধ্যেও চারিদিক স্তব্ধ চরাচর, স্তব্ধ গোটা পৃথিবী। সেখানে ‘ধুমকেতু’ স্তব্ধতাকে ভাঙছে, বিপ্লবের পথে অগ্রসর করছে সহস্র বলবান যোদ্ধাকে। ‘ধুমকেতু’ তার ‘চামর’ (চমরী গরুর ল্যাজ দিয়ে তৈরি পাখা বিশেষ, যা অশুভকে দূর করে) ঢোলাচ্ছে, আর বিবর্ণ চুলের (ঝামর কেশ) ঝাপটায় গগনকে দোলাচ্ছে। আকাশ

বাতাস দোদুল্যমান সংহার মূর্তিতে, যেন হনুমান তার ল্যাজে আগুন দিয়ে লঙ্কাকান্ডে মত্ত, যেন পাগলিনী জনা পুত্রশোকে বীরা হয়ে চুল এলিয়ে ভূমিকম্পের গতিতে মাথা নাড়তে মত্ত। এই মত্ততা যেন সর্বনাশীর জ্বালামুখের মতো।

কবিতায় দেখি 'বিশ্বপাতা' বা ঈশ্বরের বুকে তরবারি (কৃপান) ঝুলছে। আসলে এই ঈশ্বরের বুকে তরবারি বা মর্ত্যমাতার বুকের উপর তরবারি এক বীরত্বের প্রতিস্পর্ধী, যা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় গোটা চরাচরকে। আর 'ধুমকেতু' তো নজরুল'এর সৃজন চরাচর; তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই ধূমকেতুর সৃজনে কোনো কৃত্রিম রঙ বা মেকি ঢং ছিল না; ছিল বাস্তব সত্য, অমলিন বিবর্ণতা। যা জটাভার অরাজক জটিলতা ও জীর্ণতাকে দূর করতে পারে। যার ঝাপটায় ভেঙে পড়ে রাজশক্তির অন্যায় প্রাচীর। যে আসলে শান্ত বুদ্ধ মূর্তির প্রাজ্ঞতা নয়, বরং চঞ্চল রুদ্রমূর্তির সংহারক; জগৎ বিজ্ঞ। এই ধূমকেতু পূর্বজন্মের কর্মফলের প্রতীকরূপ হলেও (১০৩১ সালে আলবেরুনী রচিত 'ভারততত্ত্ব' বইতে তিনি দেখিয়েছেন, ধূমকেতুর আবির্ভাবকে ভারতীয়রা পূর্বজন্মের কর্মফল হিসেবে দেখেন) নজরুল কলমে তা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে সত্যদ্রষ্টা রূপে। প্রসঙ্গত, ১৯২০ সালের 'হ্যালীর ধূমকেতু' নিয়ে একটি কবিতা লেখেন নজরুল এবং ১৯২২ সালে ১২ আগস্ট তা আবার তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশও করেন। নজরুল আসলে এই 'ধূমকেতু'কে দেখেছেন প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং খেয়ালী অনাসৃষ্টি হিসেবে, যার আগমন ভারতবর্ষের আন্দোলনমুখর প্রেক্ষাপটে একান্ত কাম্য ছিল। এই আগমনের স্বাগতমন্ত্রই তো কবিতায় 'জয়ধ্বনি' রূপে ধরা পড়েছে।

চতুর্থত, কবি বিপ্লববাদের পক্ষে যে 'জয়ধ্বনি' তুলেছেন তা কবিতা পেড়িয়ে সমগ্র প্রতিবাদমুখর কর্মপ্রেরনার 'জয়বাণী' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি সেই জয়-বাণী? গভীর মনোবলের ওপরই যে স্বাধীনতার ফল মেলে, পোক্ত বাহুবলের ওপরই যে বিশ্বমাতার স্থানলাভ সম্পন্ন হয় তা সহজেই বলে দেন কবি— 'বিশ্বমায়ের আসন তারই বিপুল বাহুর পর', আর এই বিশ্বমায়ের জন্যই তো রুদ্রমূর্তির ধারন। শিবের তৃতীয় নয়নে সর্বক্ষমতার বাস। 'সর্বক্ষমতা' বলতে বোঝায় সূর্যকে, যার বারোটি রূপের (সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, আর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, ধাতা, ভগ, মিত্র, বরুণ, গর্জ্জন্য বিষ্ণু) মিলিত তেজ ভয়ংকর হয়ে উঠবে বিপ্লবীদের মনে। যা ভয়াল। যা দিগন্তরের বিভিন্ন দিকে মধ্যাহ্নসূর্যের মতোই তীব্র। তাই কবি বলেছেন— 'পিঙ্গল তার ত্রস্থ জটায়!' এই রূপ তেজীয়ান রবির, যার আগুনে হলুদ আভার লাল পিঙ্গল রূপ গোটা সৌর জাগতকে ভীত ত্রস্থ করে তোলে। যা ধূমকেতুকেও (ধূমকেতু একটি ক্ষুদ্র বরফাবৃত সৌরজাগতিক বস্তু যা সূর্যের খুব নিকট দিয়ে পরিভ্রমণ করার সময় কমা বা লেজ আকৃতি প্রদর্শন করে। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের ওপর সূর্যের বিকিরণ ও সৌরবায়ুর প্রভাবের কারণে এমনটি ঘটে) প্রভাবিত করে। এই 'দ্বাদশ রবি'র দীপ্তি, এই 'পিঙ্গল সূর্যে'র তেজ যেমন নজরুল মানসিকতায় ও নজরুল সৃজনে আসীন ছিল, তেমনই ছিল যৌবনের তেজে উদ্দীপ্ত মধ্যবয়সী নবযুবা ভারতবাসীদের। তারাই প্রকৃত 'প্রলয়ঙ্কর।' তাদের জন্যই কবির 'জয়ধ্বনি।' তাইতো কবি গেয়ে উঠেছেন—

> "দ্বাদশ-রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,/ দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গ তার ত্রস্ত জটায়! বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—/ হাঁকে ঐ জয় প্রলয়ঙ্কর!/ তোরা সব জয়ধ্বনি কর!"

পঞ্চমত, 'জয়বাণী'র যে তিলক কবি ললাটে ধারন করলেন তাতে জগৎ জুড়ে প্রলয়কে স্বাগত জানাবে। এই প্রলয় কালো অন্ধকারের মতো কিংবা মহানিশার কাল-রাতের মতো 'সংহারক' হলেও, প্রকৃতির নিয়মে রাতের শেষে নতুন ভোরের জন্ম দিয়ে হেসে উঠবেই। ধ্বংসের মধ্যেই তো সৃষ্টির বীজ লোকানো, মুমূর্ষুকে নাড়া দিলেই তো সে সৃষ্টিশীলতায় মেতে উঠবে— তাই প্রলয়ে ভয় নয়, 'জয়ধ্বনি'র কথায় বলে গেছেন কবি। ভয় না পাবার মন্ত্র 'মাভৈঃ... মাভৈঃ' উচ্চারনে কবি প্রত্যেককে জাগরিত করতে চেয়েছেন। স্মরণ করিয়েছেন— 'দীগম্বরের জটায় শিশুচাঁদের কর'এর কথা। দীগম্বর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। যে শিব জটাধারী, যে শিব প্রাচীন, যে শিব প্রাচীন সংস্কারের জটকে জটাবন্দী করে রাখতে পারে। সেখানে আবার 'শিশু-চাঁদ' এর অবস্থান। যে 'শিশু চাঁদ' পরিণত স্বাধীন পূর্ণচন্দ্র নয়, অপরিণত

অথচ ধারালো বাঁকা অর্ধচন্দ্রের মত, যা ধারালো বাঁকা তরবারীর মতো, যা জটপাকা পরধীন বাঁধনের ওপরে শিশুরূপে উদিত হয়ে দেখাতে পারে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্নকে। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যই কবির 'জয়ধ্বনি।'

ষষ্ঠত, স্বাধীনতার প্রসাদেই তো ঘর ভরে উঠবে। কিন্তু সমস্যা— 'দেবতারা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে,' দেবতারা বাঁধা 'পাষাণ-স্তূপে।' কবি বলেন—

"ঐ যে মহাকাল সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড় তুফানে!
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।
গগন-তলের নীল খিলানে!
অন্ধ কারার অন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে!"

'যজ্ঞ-যূপ' হল— যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে বলি তারই হাড়িকাঠ। কিন্তু হাড়িকাঠে পাথরের স্তূপে-অন্ধকারাগারে বন্দী দেবতা আসলে কারা? দেবতা? 'দেবতা' হল মানুষই, সমগ্র ভারতবাসী। যারা ইংরেজদের অন্ধ অনুশাসনে বন্দী। তবে এই সংকট যে শীঘ্রই মোচন হবে তাও জানান কবি। নবীন বিপ্লববাদের শুভাগমনে এই বন্দীদশা ঘুঁচে যাবে। আর এই আগমনের শব্দ নজরুল শুনতে পাচ্ছেন, তাই বলেছেন— 'এই তো রে তার আসার সময় ওই রথঘর্ঘর'। আর এই শব্দ সমগ্র দেশবাসীকেও শোনাতে চেয়েছেন। এই রথঘর্ঘর শব্দের প্রতি, এই মহাকালের রথের প্রতি কবির অটল বিশ্বাস। অবিরাম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় মেসোপটেমিয়ার যোদ্ধাবেশেই কবি করে ফেলেছিলেন (তা পূর্বে প্রসঙ্গত বলাও হয়েছে)। আর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় সেই অভিজ্ঞ-প্রজ্ঞতার চিত্রকল্পকেই ফুটিয়ে তুললেন। কবিকল্পনায় সেই মহাকালের রথের ঘোড়া রক্তমুখী বিদ্যুতের ন্যায়, যা বেত্রাঘাতের মতোই তীব্র। যা রনিয়ে ওঠে, হুংকার করে ওঠে হ্রেষার (ঘোড়া) ডাকের মতো। যা গর্জে ওঠে, ধমকে ওঠে ঝড় তুফানের প্রতাপের মতো। এই তেজ তো কবির স্বভাবজ। তিনি নিজের পরাধীন জন্মভূমিতে ফিরে এই তেজের জাগরনের জন্যই 'জয়ধ্বনি'তে মত্ত হয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের আকাশ তো রোদেলা নয়, বরং আঁধারে মেঘের। আর এই মেঘের মাঝেই মেঘে মেঘে ঘর্ঘর লড়াই, ঘর্ঘর বজ্র-বিপ্লব শোনা যায়। চমকে ওঠে তখনই বিদ্যুৎ। কবি এই বিদ্যুৎ চমকানোকেই মহাকালের 'সারথীর চাবুক' বলে মনে করেছেন। ঝড় বৃষ্টির আগমনকে মনে করেছেন যুদ্ধ-ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। আর এই ঘোড়ার খুরের (কবি 'ক্ষুর' বলেছেন) আঘাতে আকাশের নিল খিলানে (স্থাপত্যে) অগ্নিময় উল্কাপাত বর্ষিত হচ্ছে। কবিকল্পনায় এটাই রনাঙ্গনের প্রকৃত চিত্র। রণাঙ্গনের এমন চিত্রকে এমন সুন্দর অভীধায় নজরুল ব্যতীত আর কোন যোদ্ধাই বা দেখাতে পারেন!

সপ্তমত, কবি পুনরায় বলে দেন প্রকৃত চিরসুন্দর এর চিত্রিত বর্ণনাকে। সৃজন চিরসুন্দর। সৃজন কি? সৃজন হলো শিল্পির সৃষ্টি। সৃষ্টিময় শিল্পি কারা? সৃষ্টিময় শিল্পি হলো যারা অন্ধ অনুকরণহীন, যারা পূর্বের যা কিছু তাকে অতিক্রম করে (ভেঙে) নতুন করে গড়ে থাকেন। আর ভেঙে গড়ার কাজ বিপ্লবীদের মধ্যেই আসীন থাকে বেশি। আসলে তাঁরাই প্রকৃত শিল্পি, যাঁরা নতুন দেশকে গড়তে চলেছেন পুরাতনকে বিনষ্ট করে। তাই ধ্বংস দেখে ভয় পাওয়া পুরাতনপন্থী ভীরু মানুষদের কবি জানান দিয়েছেন। বলেছেন — 'আসছে নবীন— জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!' এই অ-সুন্দর পরাধীনতা ছেদ করে নূতন সৃজন একমাত্র প্রলয়েই সম্ভব। এই সম্ভাবনাময় প্রলয় কবির দৃষ্টিতে তাই বিপ্লবীমুখ 'সদা মধুর হাস্য' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই নব উজ্জ্বলিত দিনের নিমিত্তেই ভারতবাসীকে কবির 'জয়ধ্বনি' করতে বলা।

অষ্টমত, নজরুলদৃষ্টিতে নারীভাবনার দুরন্ত এক চিত্র আমরা কবিতায় দেখতে পাই। কবি চিরসুন্দরের আশ্রয়দানকারী জগৎজন্মদাত্রী জগৎপালক 'নারী'কে আহ্বান করেছেন—

"ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তরে ডর?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্! —
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর!
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর! —
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!"

কবি চিরসুন্দরের আশ্রয়দানকারী জগৎজন্মদাত্রী জগৎপালক 'নারী'কে আহ্বান করেছেন। যে নারী ভারতমাতার আর এক রূপ, যিনি পারেন তার মাঙ্গলিক চেতনে সেই আগতপ্রায় সুন্দর স্বাধীনতাকে বরণ করে নিতে। যিনি স্বাধীন সোনালী সূর্যকে নিজের বুকে স্তন্য রূপে ধারণ করে পুষ্ঠ করতে পারেন তার সন্তানদের। সেই নারীদের হাতে প্রদীপ তুলে ধরার কথা জানিয়েছেন কবি। গৃহলক্ষী বধূর প্রদীপ তুলে ধরার নিমিত্তেই তো 'জয়ধ্বনি।' বধূদের এই প্রদীপ তুলে ধরা ধ্বংসের মধ্যে মঙ্গলময়তাকে জারি রাখার ইঙ্গিতবাহী। কবি সেই মঙ্গলময় সুন্দরকে আসতে দেখেছেন, তবে তা সুন্দরের বেশে নয়। আসলে পৃথিবীর কোন সুখ, কোন সুন্দর, কোন স্বাচ্ছন্দ্যই সহজে আগত হয়না; এই আগমনের পিছনে থাকে যেমন কষ্ট, তেমনই থাকে ত্যাগের কর্মমুখরতা। তাই 'সুন্দর'এর আগমনও ঘটে প্রলয়ঙ্কর যোদ্ধার সুন্দরের জন্য লড়াই'এর পর। যার বেশ পেলব ফুলের মতো নয়, কাঁটার মতো। তাই কবির দৃষ্টিতে সুন্দরের আগমন ঘটেছে 'কাল-ভয়ংকর'এর বেশে।

আসলে ভয়ানক সহ্য করেই তো মানুষ ভয়হীন অভয়কে পায়। ভাঙনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নতুন সৃষ্টির বীজ। পৃথিবীর প্রতিটা সৃষ্টিই যেখানে কোন কিছু ভেঙে হয়, সেখানে স্বাধীন ভারতের জন্মের জন্য ভারত ভূমে প্রলয় অনিবার্য। আর এই তান্ডব প্রলয়ই স্বাধীনতার উল্লাসের পথকে সুগম করবে। কবি এই উল্লাসের পথকে সুগম করতেই 'জয়ধ্বনি' করার কথা বারবার বলে উঠেছেন কবিতায়। প্রতিটি স্তবকের শেষে বারবার উচ্চারিত "তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!" এর ধ্রুবপদ কবিতাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

কবিতার মধ্য দিয়ে এমন প্রতিশ্রুতি ক'জন পেরেছেন দিতে আধুনিক বাংলা কবিতায়। 'বিদ্রোহী কবি' বলে নজরুলকে দেখা হয়, ডাকা হয়। তার যথার্থতাও আছে। কিন্তু 'বিদ্রোহ' করলেই যে তিনি আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিশ্রুতিমান হবেন এমনটা নয়। কিন্তু নজরুল এক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কবিতা লিখে গেছেন তাঁর ঋজু ব্যক্তিত্বের জোরে। মৃত্যু তাঁর কাছে বলিদানের ন্যায় হয়ে জয়ের সামিল হয়েছে, পরাজয়ের গ্লানি ছুঁতে পারেনি কোনোদিন। তাই তো তার লেখনীতে এত প্রানবন্ততা! এত প্রান-প্রাচুর্যের রসদ! আর একশো বছর পর আমরা আজ রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা কিংবা করোনা পরিস্থিতে মানসিক ভাবে কাবু। আসলে আমরা আজও তাঁকে ছুঁতে পারিনি। আমরা নজরুল কে বুঝেছি! নজরুল'কে বুঝিনি!

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড (১৮৯১-১৯৪১), আনন্দ, কলকাতা ৭০০০০৯, সপ্তম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১৩, পৃ. ২৯৮
২. আহমদ, মুজফ্ফর, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', মুক্তধারা, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ১২৬-১২৭
৩. ইসলাম, রফিকুল : নজরুল-জীবনী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১৮০-১৮১

আকর গ্রন্থ :

১. নজরুল ইসলাম, অগ্নি-বীণা, আর্য্যপারিশিং হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৩০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. বাঁধন সেনগুপ্তের 'কবি নজরুল ও অন্যন্য প্রসঙ্গ' ,পুনশ্চ, জানুয়ারি, ২০১০